নতুন প্রযুক্তির সাথে যা নেই...

আবীর হাসান

নতুন প্রযুক্তি কি নতুন ধারণার জন্ম দেয়? এ প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধায় বলা যায়–সে তো দেয়ই। আর দেয় বলেই মানবসভ্যতা নতুন নতুন মোড় নেয়। বিশেষ করে যেসব প্রযুক্তি পেশাগত উপকরণ হয়ে ওঠে, সেগুলো বিভিন্ন যুগের মানুষকে নতুন করে ভাবিয়েছে এবং নতুন করে কিছু ধারণা নিয়ে চলার জন্য উদ্যমী করেছে। তাই ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস আসলে কী? নিছক মানব-অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া থেমে নেই। প্রক্রিয়াটা চলমান থাকার সৃষ্টি হয়ে চলেছে নতুন নতুন ইতিহাস।

আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, সব যুগেই সব মানুষ যেহেতু অভিজ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকে সেহেতু সে ইতিহাস সৃষ্টি করে করেই চলে। কিন্তু সব মানুষের এ বিষয়ে সচেতনতা থাকে না। সেই অনেক আগে মধ্যযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে যখন বারুদ আবিষ্কার হয়েছিল, তখন বারুদের আবিষ্কর্তা নিজেই জানতেন না যে, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উদ্ভট এক পরীক্ষা চালাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণটাই দিয়েছিলেন তিনি। তবে ওই বারুদ থেকেই অন্যান্য বিস্ফোরণের ধারণা নিয়ে কাজ করতে করতে মানুষ পৌঁছে গিয়েছিল কামান, বন্দুক, ডিনামাইট এসবের প্রযুক্তির মধ্যে। এই ডিনামাইটের কথাই ধরুন–পাহাড় কেটে কেটে খনিজ আহরণের কঠোর পরিশ্রমের কাজকে খানিকটা সহনীয় করতে আলফ্রেড নোবেল আবিষ্কার করেন ডিনামাইট। কিন্তু তার জীবদ্দশায়েই সেই ডিনামাইট যুদ্ধে ব্যবহার শুরু হয় এবং উন্নত এই বিস্ফোরকের 'গুণে' বদলে যায় ইউরোপের মানচিত্রটাই। ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে। আলফ্রেড নোবেল মর্মাহত হয়েছিলেন, বিভিন্ন দেশের সরকার আর জ্ঞানী-গুণী মানুষকে অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। কেউ শোনেনি তার কথা। শেষ পর্যন্ত শান্তি আর মানবকল্যাণে জ্ঞানার্জনে অবদান রাখার জন্য প্রচলন করেন পুরস্কারের, যা তখন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার।

তার আগে কামান আর মাস্কাই বন্দুকও কম খেলা দেখায়নি। কামানের কল্যাণে ভারতবর্ষে ইতিহাস বদলে গেছে। বাবর তার মোঘল বংশের জন্য যেমন পেয়েছিলেন স্থায়ী ঠিকানা, তেমনি ভারতও প্রবেশ করেছিল ইতিহাসের অন্য এক পর্বে। ওই কামান আর বন্দুকই নতুন পৃথিবীর বিদ্রোহীদের (দুই আমেরিকা মহাদেশ) শক্তি যুগিয়েছে, যা ইউরোপীয় রাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে বিতাড়িত করেছে লাভজনক উপনিবেশগুলো থেকে।

এরপর আঠারোতম শতকের মাঝামাঝি থেকে আবার প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন আর পরিবর্তন। যেগুলোর বেশিরভাগই ঘটেছে 'নতুন স্বাধীন' যুক্তরাষ্ট্র নামের দেশটিতে। নতুন প্রযুক্তি যে নতুন ধারণা নিয়ে চলতে সাহস ও শক্তি জোগায় তার প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যতই আমরা যুদ্ধবাজির জন্য দেশটিকে 'হিংসা' করি না কেনো, ওদের ধারণাটাই এখন হয়ে উঠছে বাকি বিশ্বের ধারণা। পরমাণু শক্তি দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, এখন তা এসে ঠেকেছে কমপিউটারে। কমপিউটারভিত্তিক কর্তৃত্ব আয় ব্যাপক বহুমাত্রিক উদ্ভাবনগুলোকে আমাদের মূল্যবোধে খ্যাপামি ছাড়া অন্য কিছু বলার সুযোগ নেই। সত্যিই অন্য কোনো দেশ হলে ওই খ্যাপামিকে পাত্তা দিত না। যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে চার্লস ব্যাবেজকে পাত্তা দেয়নি ইংল্যান্ড। অথচ ওই শতকেই যুক্তরাষ্ট্র আদমশুমারির সহায়তাকারী যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯৪৪ সালে মার্ক-ওয়ান যে আকারের ছিল অন্য দেশ হলে তাকে কাজে লাগানো বা নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করা দুরূহ হতো নিঃসন্দেহে।

এসব কথাকে বাগাড়ম্বর মনে হতে পারে, কিন্তু কমপিউটারায়ন–ডিজিটাল বাংলাদেশ ইত্যাদি নিয়ে যারা ভাবেন তাদেরকে বলছি–আর একটু ভাবুন। হ্যাঁ, নতুন ধারণা নিয়ে আপনারা ভাবছেন বলেই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছেন, কিন্তু সেটা কতটা নতুন ধরনের জ্ঞানভিত্তিক? এ প্রশ্নের কারণ এখন পর্যন্ত বিশেষায়িত যে কর্মকা দেখা যাচ্ছে, তা অনেকটাই জ্ঞানবিবর্জিত। মুখে জ্ঞানের কথা বললেই সবকিছু জ্ঞানভিত্তিক হয়ে যায় না। গত সাড়ে তিন বছরে কাজটা যে হয়নি, সেটা খুব প্রকটভাবেই চোখে পড়ছে। প্রবণতা যেটা দেখা যাচ্ছে তাহলো তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কিছু পণ্য এবং আরও কম সার্ভিস পৌঁছানোর চেষ্টা। কিন্তু প্রত্যয়টা অর্থাৎ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১'-বিষয়ক ধারণার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হয়েছিল কিংবা তারও আগে ১৯৯৬ সালের পর তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া কমপিউটার আমদানির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহারের পর যে ধরনের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন সে ধরনের কর্মকা র পরিচয় খুব একটা দৃশ্যমান নয়। এ ছাড়া ২০০৩ সালে জেনেভায় বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তি সম্মেলনে যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল তার আলোকেও অগ্রগতি খুব একটা লক্ষণীয় নয়।

বর্তমান বিশ্বে ঐতিহাসিক বা মানব-অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়া পুরোপুরী কমপিউটারনির্ভর। এ কারণেই হয়ত তথ্য দেয়া-নেয়া এবং জ্ঞানচর্চার বিষয়গুলোও কমপিউটারনির্ভর হয়ে পড়েছে। এ যুগের যা কিছু শুভ এবং কল্যাণকামী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, সবই নিবন্ধিত ও প্রচারিত হচ্ছে কমপিউটারজাত বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে। মৌলিক চাহিদার অন্যান্য বিষয়ের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছে কমপিউটার। রাষ্ট্রীয়ভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেগুলো এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিশেষজ্ঞ প্রক্রিয়া এখন কমপিউটারের আওতায় এসে গেছে। এক কথায় বলা যায় 'সাইবারনেটিকসের' আদি প্রত্যয়ের বাস্তবায়ন হয়ত অনেকটা করে ফেলেছে কমপিউটার এবং এ সম্পর্কিত প্রযুক্তি। ওই প্রত্যয়টিতে বলা হয়েছিল 'এক সময় মানবকর্মের সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে কমপিউটার'। এখন পর্যন্ত ওই সবকিছুর অর্ধেকটাও হয়ত কমপিউটারের নিয়ন্ত্রণে আসেনি কিন্তু প্রক্রিয়াটাচলমান। এই প্রক্রিয়ায়বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ইতিবাচক এবং অনেকটাই আশাবাদী হওয়ার মতো, কিন্তু এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটা নিয়ে। নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতিভিত্তিক নতুন কিছু আমাদের চাই-ই চাই।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, কমপিউটার প্রযুক্তি এ যুগের মানুষের পেশাগত উপকরণ হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ ভাবছে কেমন করে প্রযুক্তিটাকে সঠিকভাবে ব্যবহারসহ মানব উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। সঠিক ব্যবহার কেমন হবে তা নিয়ে সচরাচর বিতর্ক তেমন একটা হয় না আমাদের দেশে। যারা বিষয়গুলো নিয়ে কথাবার্তা বলেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব সহজ উপায়টাই বাতলে দেন–'তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানো'।

প্রকৃতপক্ষে 'তৃণমূল' শব্দটা যতটা আবেগের উদ্রেক ধরে তৃণমূলের বাস্তব অবস্থাটা অন্তত আমাদের দেশে খুব একটা এই প্রযুক্তিবান্ধব নয়। উল্টো দিক থেকে দেখাতে চেষ্টা করছি বলে মনে করতে পারেন অনেকে এবং সত্যিই আসল বিষয়টা উল্টোই। এতদিন সরকার প্রযুক্তিবান্ধব কি না, এই নিয়েই আমরা বিতর্ক করেছি, কিন্তু এখন ওই বিতর্কটা অসার হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। কারণ, সরকার চাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ঘটুক। কিন্তু ঘটাবে কে? ঘটাবে তো জনসাধারণ। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে যা ঘটানোর দরকার, তৃণমূলের জনসাধারণ তা ঘটাচ্ছে না বা ঘটাতে পারছে না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে জনসাধারণ যাদের কাছ থেকে নির্দেশনা পেতে পারে, তাদের কাছ থেকে ঠিকমতো নির্দেশনা পাচ্ছে না। অথবা বলা যায় তাদের সে ধরনের ক্ষমতাই নেই, চিন্তাই নেই। সরকার একটা লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে, কিছু সুবিধাও দেয়া শুরু করেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পণ্য অর্থাৎ কমপিউটার নামের যন্ত্রটা দিকে দিকে পৌঁছানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছেন এক ধরনের ব্যবসায়ী মানুষ। প্রস্তুতকারী তো কেউ নেই–আমদানিকারক, অ্যাসেম্বলার আর রিসেলার-রা চাচ্ছেন সরকার আরও 'এমন কিছু' করে দিক, যাতে তাদের বিক্রি-বাট্টা বাড়ে। বিভিন্ন সেবা যারা দিচ্ছেন তারাও চাচ্ছেন সরকার তার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এমন কিছু করুক যাতে সাধারণ মানুষ মুড়ি-মুড়কির মতো না হোক, কলম-পেন্সিলের মতো কমপিউটারের সার্ভিস কিনবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ডিভাইস এবং সার্ভিস বিক্রি হলেই যে আমদানি কিছু হয় না, তার প্রমাণ ▸

মোবাইল অপারেটরেরা। পরিসংখ্যানের শুভঙ্করের হিসাব অনেক নতুন কিছু জানায় কিন্তু তার কতটা সত্যি? অর্থাৎ সিম বিক্রির যে তথ্য আমরা পাচ্ছি, তার কত শতাংশ ব্যবহার হচ্ছে তা কী আমরা ঠিকমতো জানি। আমরা কি জানি কী পরিমাণ সেট এ পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে?

লাভজনক সার্ভিসগুলো মোবাইল অপারেটরেরা যে চালাতে পারছেন না, সেটা বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায়। অর্থাৎ কথা বলাবলি ছাড়া অন্য সার্ভিস যেমন–এসএমএস, এমএমএস, ভয়েস মেইল এগুলো ঠিকমতো চলছে না, চালানোর জন্য নানা ধরনের অফার দেয়া হচ্ছে।

আমাদের সমস্যাটা এই বিষয়টাকে ধরেই মূল্যায়ন করতে পারি। মোবাইল সিম-সেট যাদের কাছে আছে তারা সবাই এসএমএস ব্যবহার করতে পারে না। এসএমএস করা তো দূরে থাক, এসএমএস খুলে পড়তে পারার সক্ষমতাও বেশিরভাগ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর নেই। কথা বলা আর শোনার কাজই করেন বেশিরভাগ ব্যবহারকারী, এমনকি সেভ করার প্রক্রিয়াটাও অনেকের জানা নেই। এসব সমস্যার কারণে অনেকে সেট-সিম কিনে ব্যবহার করছে না। সংখ্যাটা বেশ ভয়াবহ রকমেরই–যে পরিমাণ সিম বিক্রি হয়েছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে হিসাব দেয়া হয় সে হিসাবটা আসলে ব্যবহার্য সিমের নয়। অব্যবহৃত সিমের সংখ্যা নাকি ভয়াবহ রকমের কম! সে কারণে হরহামেশা দেয়া হয় বন্ধ সিম চালু করে ফ্রি সার্ভিস পাওয়ার বিজ্ঞাপন।

এ থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়–সিদ্ধান্তটা তাত্ত্বিক অর্থাৎ যন্ত্র ও প্রযুক্তির সাথে সাথে জ্ঞান না পৌঁছানোতেই সৃষ্টি হয়েছে এ সমস্যা। যারা হুজুগে হোক বা অন্যকে ব্যবহার করতে দেখে হোক, সিম-সেট কিনেছিলেন কিন্তু যন্ত্র ও প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের জ্ঞান না থাকায় বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অনেকে বলতে পারেন একাধিক সিম যারা কিনেছেন তারাই কোনো কোনো সিম বন্ধ রেখেছেন। অস্বীকার করছি না। এরকম ব্যাপারও আছে কিন্তু শহরে ও গ্রামগঞ্জের স্বল্প আয়ের মানুষ প্রযুক্তির সাথে ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় তাদের কাছে প্রযুক্তিটাকে নিছক বিড়ম্বনা বলে মনে হচ্ছে।

কমপিউটারের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে। এজন্য গ্রামে-গঞ্জে যেতে হবে না, রাজধানী শহরের বিভিন্ন অফিস-আদালতে গেলেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। কমপিউটার আছে, ইন্টারনেট সংযোগ আছে কিন্তু তার ব্যবহার নেই। কোথাও কোথাও লোক রাখা আছে ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার রাখে। ওই পর্যন্তই। স্যারেরা তা ব্যবহার করেন না। কোনো কোনো স্যার আজকাল ফেসবুক ব্যবহার করছেন। কোনো কোনো স্যারে অভ্যস্ততা তৈরি হয়েছে শেয়ারবাজারের খবরাখবর রাখার। কেউ কেউ একজন অপারেটর রেখেছেন যারা টাইপরাইটারের বদলে টাইপ করেন কমপিউটারে, কেউ কেউ অন্যের ই-মেইল নামিয়ে দেন। এর চেয়ে বাজে ব্যাপার চলছে ঘরবাড়িতে, কমপিউটার আছে ড্রইংরুমে, ব্যবহার হয় মুভি দেখতে বা গান শুনতে। গেমিংয়ের জ্ঞান পর্যন্ত নেই বাড়ির ছেলেমেয়েদের, কারণ তারা ডোরেমন বা সিআইডি দেখে বিনোদনে মেতে অভ্যস্ত।

এই সমস্যাটা প্রযুক্তির প্রসারকে ঠেকিয়ে দিয়েছে। সমস্যাটাকে কি চিহ্নিত করতে পেরেছেন? প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান এবং উপযোগিতার বার্তা পৌঁছায়নি দেশের বেশিরভাগ লোকের কাছে।

কেনো পৌঁছল না? দায়িত্বটা বর্তায় কার ওপর? সিম-সেটের মতো যন্ত্র ও সার্ভিসের ব্যবসায় যারা করছেন, তাদের কাছে মনে হতে পারে সরকারের উচিৎ যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। এখন সমস্যা হচ্ছে সরকার তো আর নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়। ওখানে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকজন থাকারই কথা এবং নতুন প্রযুক্তি তাদের মনে নতুন ধারণা সৃষ্টি করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে ওই স্যারদের নিয়ে। আর কমপিউটার তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে কি না এবং পারলেও তা কেমন সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাদের নেই। তারাই আবার রাষ্ট্রীয় নীতি এবং কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেন কিংবা নেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এদের বেশিরভাগই ভাসাভাসাভাবে জানেন কমপিউটারের ক্ষমতা অনেক, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানে এরা দেখেন অফিসে টাইপরাইটারের বিকল্প আর মেইল দেয়া-নেয়ার মাধ্যম আর বাড়িতে ফেসবুক, ভিডিও আর অডিও ব্যবহারের যন্ত্রমাত্র। তথ্যের ক্ষমতা বা তথ্যের সর্বজনীনতা নিয়ে তেমন কোনো ধারণা এরা কখনও পাননি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেও যেমন পাননি তেমনি কর্মক্ষেত্রের প্রশিক্ষণ থেকেও পাননি।

সচ্ছল পরিবারের সন্তান কিংবা অভিজাতদেরকে যেমন বোঝানো হয়েছে কমপিউটার অনেক কাজ নিজে নিজেই করে দিতে পারে, যন্ত্রটা জ্ঞানও দিতে পারে, তাই একটা যন্ত্র সংগ্রহে রাখা যেতে পারে। তেমনি বেসরকারি সংস্থা ব্যাংক-বীমার কর্মীরা ছাড়া অন্যদেরও ওরকমই বোঝানো হচ্ছে। অনেকে কিনছেন, বাজার খানিকটা বাড়ছে, কিন্তু কমপিউটারের মালিকানা আছে এমন অনেকেরই জ্ঞান নেই কতটা শক্তি ধরে কমপিউটার।

এই সময়েও বাংলাদেশে অনেকেই কমপিউটারভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে বিলাসিতা মনে করছেন। তাদের আশপাশে যন্ত্রটা আছে কিন্তু জ্ঞান নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা এটা ঠিকমতো দিতে পারছে না, দিতে পারছে না পেশাগত প্রতিষ্ঠানগুলো। এই জ্ঞানটা যদি আমাদের না হয় তাহলে অন্য নতুন জিনিস নিয়ে আমরা ভাবতে পারব না। মনে রাখতে হবে প্রযুক্তির সাথে সাথে দিতে হবে জ্ঞান, জ্ঞানহীনতা প্রযুক্তিকে অসার করে তোলে।

আরেকটি বিষয়কে খুবই গুরুত্বের সাথে নিতে হবে, অন্তত যারা বুঝেছেন তাদের। বিষয়টা হচ্ছে এই আইসিটিকে ব্যবহারে কিছু নতুন ধারা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। এই প্রযুক্তি নিয়ে নিজেদের কিছু কনট্রিবিউশন থাকা দরকার। না হলে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না। সমস্যার অনেক বয়ান আমরা প্রতিদিন দিতে পারি। একই সমস্যার পুনরাবৃত্তিও ঘটতে পারে, কিন্তু তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। সমস্যা যা আছে তা মোকাবেলা করাই, যুগধর্ম, অন্তত এই ডিজিটাল যুগের। আর সে কারণেই তৃণমূলের দিকে আইসিটি এবং তার সেবা পৌঁছানোর পাশাপাশি উচ্চতর স্তরে প্রায়োগিক ধরনের কিছু গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অন্যদের গবেষণালব্ধ বাজারি সেবাগুলো যে ঠিকমতো সর্বক্ষেত্রে কাজ করছে না, তা বলাই বাহুল্য। এমনকি প্রচলিত আইকনভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলোও দুর্বোধ্যতার বেড়াজাল অতিক্রম করতে পারছে না। এজন্য প্রয়োজন আমাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক কিছু সফটওয়্যার। এগুলো উদ্ভাবন ও বিকশিত হবে উচ্চতর পর্যায়ে, কিন্তু সুফল ফলাবে তৃণমূল পর্যায়ে। দারিদ্র্য নিরসনে টেকসই উন্নয়ন মডেল এখন আমাদের পেতে হবে এবং তা হতে হবে অবশ্যই আইসিটিভিত্তিক। নতুন প্রযুক্তিনির্ভর নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করার জন্য এদেশের তরুণরা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের জন্য সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে, গবেষণার সুযোগ দিতে হবে–খ্যাপামি ধরনের কিছু যদি হয় তাকেও জানাতে হবে স্বাগত।

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com